পাঠক্রমের ভিত্তিসমূহ -(Bases of curriculum):-

পাঠক্রম প্রণয়ন করার আগে প্রণয়নকারীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি সমাজের চাহিদা ও শিশুর চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়, অন্যদিকে সেটি যেন আবার জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। সমাজের চাহিদা, শিশুর চাহিদা ও জীবন দর্শনের প্রতিফলন যদি পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে অনুসারিত করতে হয়, তাহলে পাঠক্রম প্রণয়নের পূর্বে প্রণয়নকারীকে সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের নীতিগুলির প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ শিশুর সামাজিক অবস্থান, শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তার জ্ঞানের প্রকৃতির আলোকে অভিজ্ঞতার আয়োজন করতে হলে পাঠক্রমের ভিত্তি হিসাবে সামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নিম্নে পাঠক্রমের বিভিন্ন ভিত্তিগুলি আলোচনা করা হল।

1) পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation of Curriculum):-

ইংরাজি শব্দ Philosophy কথাটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ Philos এবং Sophia থেকে। Philos কথাটির অর্থ হল অনুরাগ এবং Sophia কথাটির অর্থ হল জ্ঞান, এই দুটি কথার অর্থ একত্রে দাঁড়ায় জ্ঞানের প্রতি আসক্তি, এই বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য হল চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান করা এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত জ্ঞান প্রদান করা, বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে দর্শন মানুষের জীবনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করে, অর্থাৎ মানুষের জীবনের লক্ষ্য দর্শনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে শিক্ষা, বস্তুতপক্ষে দর্শন জীবনের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রণালী নির্দেশ করে শিক্ষা, আর পাঠক্রম হল উপায় যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া

②

যায়। সুতরাং দর্শনের কাজ হল শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আর শিক্ষার কাজ হল পাঠক্রমের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছানো যায় তার পথ নির্দেশ করা, এখানে পাঠক্রম হল দর্শন নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় স্বরূপ।

২) পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Foundation of curriculum):

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুই হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রধানতম উপাদান, এই উপাদানটিকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়ে থাকে, ফলে এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি শিশুর কোন অনিস্তুই না থাকে, তাহলে শিক্ষা প্রক্রিয়া অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং তা শিশুর প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হবে, কারণ যেসব সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেগুলি যদি পাঠক্রমের মাধ্যমে পরিস্ফুরণ ঘটা সম্ভব না হয় তাহলে তার ব্যক্তিজীবন পঙ্গু হয়ে পড়বে, আর এইরূপ শিশুও সমাজের কোন উপকারে আসবে না, এজন্য পাঠক্রম রচিত হবে শিশু মনের চাহিদার ভিত্তিতে, অর্থাৎ এখানে শিশুই হল প্রধান বিবেচ্য বিষয়, এ ছাড়া শিশু একটি জীবন্ত সক্রিয় সত্তা, সক্রিয়তাই হল তার উপাদানটির প্রধান ও স্বাভাবিক ধর্ম, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্টভাবে অধ্যয়ন করা এই সত্তাটির পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে পাঠক্রমটি যদি সক্রিয়তাভিত্তিক, কর্মভিত্তিক, বাস্তবভিত্তিক ও চাহিদাভিত্তিক, ও জীবনকেন্দ্রিক না হয়, তাহলে পাঠক্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে, এই ক্ষেত্রে পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৩) পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological Foundation of curriculum):

শিক্ষায় কাজ শুধুমাত্র জীবনের প্রস্তুতিতে সমাপ্ত করা নয়, শিক্ষা হল জীবন, ফলে শিক্ষার মধ্যে জীবনের পরিচয় থাকা দরকার, অর্থাৎ শিক্ষা হবে জীবনকেন্দ্রিক, যেহেতু ব্যক্তিজীবন সমাজের পটভূমিতে গড়ে ওঠে, তাই পাঠক্রমে সমাজের প্রতিফলন ঘটবে, এটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। শিশু সমাজজীবন থেকে বিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করে। আবার শিক্ষা শেষে সমাজে ফিরে যায়, এমত অবস্থায় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যদি সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া যায়, তাহলে এইরূপ শিক্ষা বাস্তব জীবনের কোন কাজে আসবে না,

তাই সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়েরও এক নিবিড় সম্পর্ক রচিত হয়। পাঠক্রমে সমাজ জীবনের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার সঙ্গে শিশুর পরিচয় থাকলে তার পক্ষে শিক্ষা সমাপনান্তে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করা অনেক সহজসাধ্য হয়। সেজন্য বিদ্যালয়ের সকল কার্যকর্মের মধ্যে সমাজজীবনের বিভিন্ন উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ পাঠক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উপাদানগুলির আয়োজন থাকবে।

* পাঠক্রমের শ্রেণীবিভাগ - (Types of curriculum):

শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্র হল পাঠক্রম। শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, পাঠক্রম ছাড়া ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে শিক্ষাদানের কাজ সংগঠিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয় তার কেন্দ্রবিন্দু হল পাঠক্রম। বস্তুতপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যভিত্তিক, সময় উপযোগী, কর্মভিত্তিক এবং গতিশীল করে তোলার প্রধান হাতিয়ার হল পাঠক্রম। শিক্ষার এই উপাদানটির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। তবে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম পরিলক্ষিত হয়, যেমন -

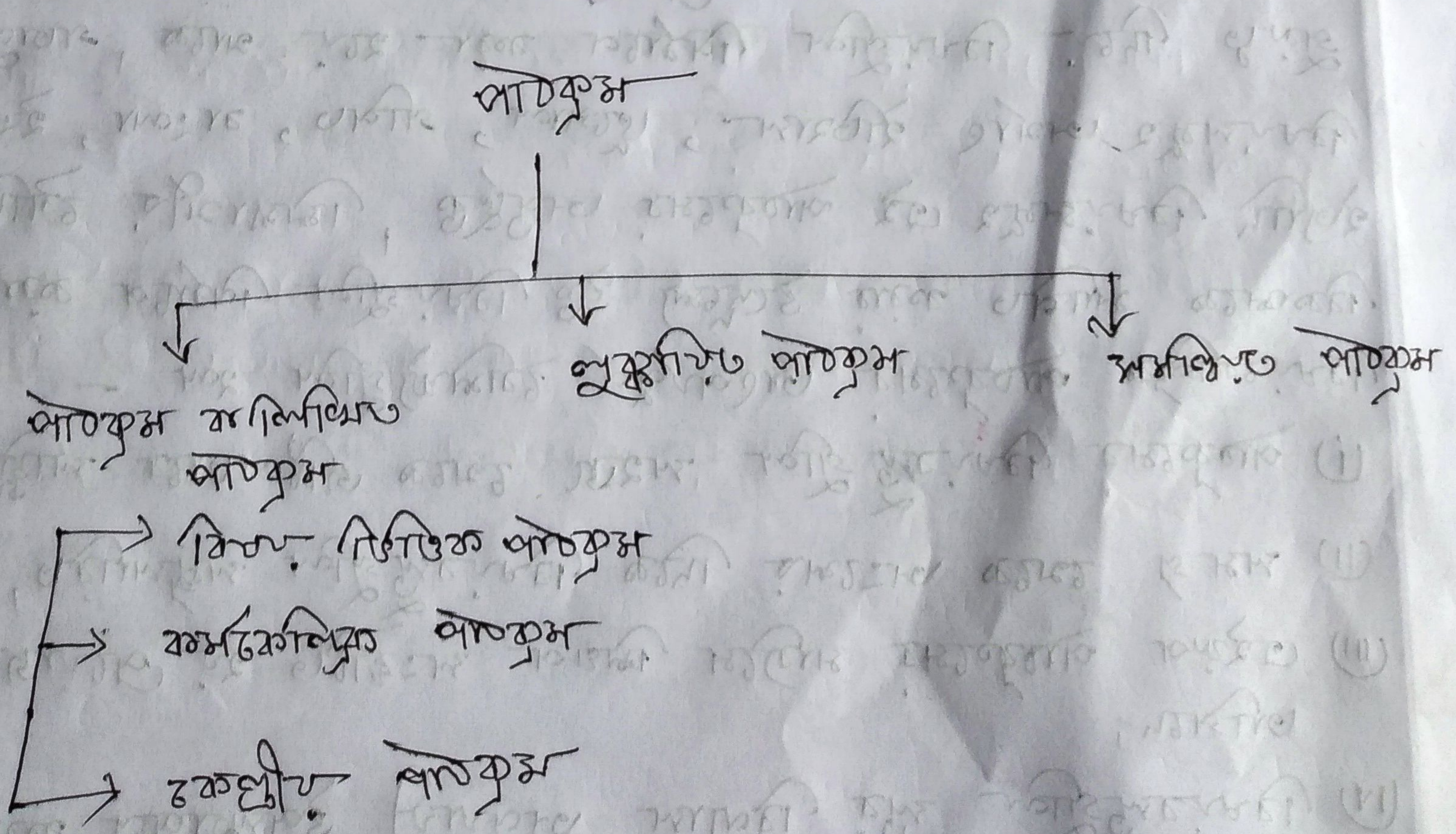

* লিখিত পাঠক্রম ঃ—

এরূপ পাঠক্রম হল পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সমষ্টি। এই ধরনের পাঠক্রম বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিখিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ক্লাসরুটিন হল এই প্রকারের পাঠক্রম। শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা অভিভাবকের কাছে এইরূপ পাঠক্রম সব সময় উন্মুক্ত থাকায় ফলে শিক্ষার লক্ষ্য এবং প্রত্যেক প্রকৃতি এর সম্পর্কে সচেতন থাকে। শিক্ষার্থীর বিকাশের স্বার্থে অত্যন্ত সচেতনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা অনুসৃত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে লিখিত পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল — (১) নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি হল একটি নিয়মভিত্তিক ও নির্দিষ্ট কর্মসূচি। (২) এই ধরনের পাঠক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (৩) বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত হয় এই ধরনের পাঠক্রম। (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই পাঠক্রমটি পরিচালিত হয়ে থাকে। ~~শি~~ সুতরাং লিখিত পাঠক্রম হল শিক্ষাবিদ কর্তৃক প্রণীত শিশু ও সমাজের চাহিদা পূরণকারী উদ্দেশ্যভিত্তিক বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে লিখিত ভাবে তৈরিকৃত একটি অগ্রসরমান প্রক্রিয়া। লিখিত পাঠক্রম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন —

1) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম ঃ—

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক বিষয়সমূহ অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বাংলা, ইংরাজি ইত্যাদি বিষয়সমূহ এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশকে ঘটিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়। বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(i) পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলি সহজ থেকে জটিলভাবে সজ্জিত।

(ii) সমগ্র থেকে অংশের দিকে বিষয়বস্তুগুলি সম্প্রসারিত,

(iii) এইরূপ পাঠক্রমের সক্রিয় শিখন সংঘটিত হয় প্রয়োজনের তাগিদে।

(iv) বিষয়বস্তুগুলি স্তর বিন্যাস অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়।

2) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম :—

সক্রিয়তার নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম। বিশেষত শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে গিয়েই এইরূপ পাঠক্রমের উদ্ভব ঘটে। জ্ঞান ও কর্ম কখনো আলাদা সত্তা নয়, কর্মের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান অনেক বেশি পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়। তবে কর্ম এখানে গৌণ আর জ্ঞানার্জন হল মুখ্য ব্যাপার। মূলত কর্ম হল জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের মাধ্যম। এই প্রসঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম হল এমন এক ধরনের পাঠক্রম যেখানে শিক্ষাদানের কাজ কিছু নির্বাচিত বস্তুর কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। এইরূপ পাঠক্রমের মূল কথা হল অভিজ্ঞতাসমূহকে শিক্ষার্থীর সামনে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে এবং তারা সক্রিয়ভাবে কর্মসম্পাদন করতে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করবে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের সংজ্ঞা হিসাবে জন ডিউই বলেছেন যে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম হল শিশুর নিজস্ব আগ্রহ ও চাহিদা নিঃসৃত নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ।

3) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম :—

গতানুগতিক পাঠক্রমের অন্যতম ত্রুটি হল নির্বাচিত বিষয়গুলির বিচ্ছিন্নবিন্যাস, এখানে বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা থাকে, এই ত্রুটি দূর করার জন্য পাঠক্রমের গতানুগতিক ভাবনা-চিন্তার মধ্যে এক নতুন ধারণার সংযোজন করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম। এই ধরনের পাঠক্রমে জ্ঞানের বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে পরিবেশন না করে পরস্পরের মধ্যে সংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত করে পরিবেশন করা হয়। বস্তুতপক্ষে এই ধরনের পাঠক্রমে শিশুর চাহিদা ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিজ্ঞতাসমূহকে সামগ্রিকভাবে পুনর্গঠিত করা হয়। অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(i) এখানে শিক্ষার্থীর একটি ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(ii) ভাববস্তুটি সম্পূর্ণভাবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত।

(iii) বিষয়গুলি আলাদা আলাদা হলেও সেগুলির অভিজ্ঞতাগুলি একটি সমগ্ররূপ লাভ করে।

* অব্যক্ত পাঠক্রম :—

অব্যক্ত পাঠক্রম হল এমন এক বিষয়ের পাঠক্রম যা পাঠক্রমের মধ্যে ব্যক্ত থাকে না অথচ পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর সামাজিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে, সেইরূপ পাঠক্রমকে বলে অব্যক্ত পাঠক্রম, এখানে লিখিত বা ব্যক্ত পাঠক্রমের মতো প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিতরণের কোনো ব্যবস্থা থাকে না, পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে কতকগুলি গুণ সঞ্চারিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে গুণগুলি হল এই পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি বোধের জাগরণ, আন্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষ, ~~অহ~~ গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুপ্রেরণা, জাতীয় ঐতিহ্যের পরিচিতকরণ, সুনাগরিকতার গুণাবলি অর্জন, আদর্শ চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ জাগরণ, নেতৃত্বের দায়িত্বগ্রহণ ইত্যাদি হল অব্যক্ত পাঠক্রমের উদাহরণ, এগুলি সরাসরিভাবে পাঠক্রমের মধ্যে উল্লেখ থাকে না। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাবে পাঠক্রমটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এইরূপ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(i) অব্যক্ত পাঠক্রমের কোনো অংশ লিখিত অবস্থায় থাকে না,

(ii) শিক্ষার্থীর এর উপাদানগুলি সম্পর্কে অবহিত না ~~মূলত~~ থাকলেও শিক্ষক বা বিদ্যালয় অব্যক্ত পাঠক্রমের উপাদানগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন,

(iii) বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলির মাধ্যমে এই পাঠক্রমের উপকরণগুলি অনুসৃত হয়ে থাকে,

(iv) শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের আচরণের ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে এই বিষয়ের পাঠক্রমের প্রকৃতি ও সংগঠনের পরিস্ফুটন ঘটে।